দৈনিক ইনকিলাব

তারিখ 13 JAN 1988
পৃষ্ঠা 5 কলাম 3

00 022

# শিক্ষাঙ্গন

## নিরক্ষরতা দূরীকরণে সমাজের দায়িত্ব

আমাদের দেশে লোক সংখ্যা বৃদ্ধির সাথে সাথে নিরক্ষর লোকের সংখ্যাও ক্রমাগত বেড়ে চলেছে। অথচ নিরক্ষরতা একটি জাতির জন্য অভিশাপ। কেননা অশিক্ষিত জাতি পরগাছার ন্যায় তার অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখে। দুঃখজনক যে স্বাধীনতার এত বছর পরেও আমাদের শিক্ষিতের হার ২৪-এর কোঠা অতিক্রম করতে পারেনি। অথচ আমাদের প্রতিবেশী রাষ্ট্র ভারতসহ বার্মা, শ্রীলংকা, মালয়েশিয়া, থাইল্যাণ্ড ও চীনে শিক্ষিতের হার আমাদের চেয়ে বহুগুণে এগিয়ে আছে। ফলে এ সকল দেশের নাগরিক রাষ্ট্রীয় ও অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে অনেক উন্নত— এ কথা নির্দ্বিধায় বলা যায়।

অতীতে আমাদের দেশে নিরক্ষরতা দূরীকরণে যত পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে তার কোটাই বাস্তবায়িত হয়নি। ফলে অবাস্তব পরিকল্পনার নামে কোটি কোটি টাকা খরচ করা হয় বটে কিন্তু আদৌ কোন ফল হয় না। বলাবাহুল্য ১৯৮৫ সনের মধ্যে ৫ কোটি লোককে নিরক্ষরতামুক্ত করার এক মহাপরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়। কিন্তু ঐ পরিকল্পনা কিছুকালের মধ্যে ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়।

আমাদের পল্লী এলাকায় শিক্ষিত লোকের সংখ্যা বেশী না হলেও কম বলা চলে না। আজকাল পল্লীতে বসবাস করেন প্রাথমিক শিক্ষক, বেকার শিক্ষিত যুবক, অবসরপ্রাপ্ত সরকারী কর্মচারী, মসজিদের ইমাম, উচ্চ বিদ্যালয় ও মহাবিদ্যালয়ের শিক্ষকবৃন্দ। এ সব লোকজনকে এক বিরাট কাফেলা বললেও অত্যুক্তি হয় না। এই বিরাট কাফেলা দ্বারা কি নিরক্ষরতা দূর করা অসম্ভব? এসব লোক মনে-প্রাণে কাজ শুরু করলে ৫ বছর কেন তার চেয়েও কম সময়ের মধ্যে দেশ থেকে নিরক্ষরতার কালিমা মুছে ফেলা সম্ভব। উল্লেখিত কর্মচারীদের মধ্যে অনেকেই কেবল মাসান্তে বেতন নিচ্ছেন এবং বসে বসে দিন কাটাচ্ছেন। তারা এ সমাজসেবামূলক কাজে মোটেই অংশগ্রহণ করতে চান না। বিশ্বের যে সব দেশ থেকে নিরক্ষরতা দূরকরা হয়েছে, তার পেছনে রয়েছে সে সব দেশের নাগরিকদের সক্রিয় সহযোগিতা ও অংশগ্রহণ। যারা পরিকল্পনা প্রণয়ন করেন, তারা বাস্তব অবস্থা ভালভাবে পর্যবেক্ষণ করেন না বলেই এসব পরিকল্পনা ব্যর্থতায় পর্যবসিত হচ্ছে।

দেশের ৬৮ হাজার গ্রামে ৮ কোটি লোক বসবাস করছে। তাদের ৯০ ভাগই নিরক্ষর। কাজেই এ বাস্তব অবস্থার নিরিখেই পরিকল্পনা প্রণয়ন করে এগিয়ে যেতে পারলেই নিরক্ষরতা দূরীকরণের কাজ সফল হবে। আগেই বলেছি, গ্রামে বসবাসকারী শিক্ষিত কাফেলাকে কাজে লাগাতেই হবে। নচেৎ সরকারের পক্ষে এ কাজে একা কোটি কোটি টাকা খরচ করেও কোন কালেও সফলতা অর্জন সম্ভব নয়।

প্রথমতঃ আমাদের দেশের শিশু শিক্ষার জন্য যে সব বিদ্যালয় চালু আছে, ওগুলোর অচলাবস্থার কারণে ৯৫ ভাগ শিশু বিদ্যলায়ে গিয়েও লেখ-পড়া শিখতে পারেনি। ফলে তারা মুর্খ হয়ে জীবন যাপন করে। অনুসন্ধানে দেখা গেছে যে, অভিভাবকদের উদাসীনতা ছাত্র-ছাত্রীদের দৈন্যদশা, শিক্ষকদের গাফিলতি ও শিক্ষক স্বল্পতা এর মূল কারণ।

আমাদের দেশের জনসংখ্যার ১/৩ অংশ শিশু। তাদের অধিকাংশই শিক্ষার আলো থেকে বঞ্চিত। এরাই পরবর্তীতে নিরক্ষর লোকের সংখ্যা বৃদ্ধি করে।

দ্বিতীয়তঃ আমাদের দেশের চালু বিদ্যালয়গুলোকে ১ম শ্রেণী থেকে ৩য় শ্রেণী পর্যন্ত এক বিদ্যালয় এবং ৪র্থ শ্রেণী থেকে ৮ম শ্রেণী অন্য বিদ্যালয় হিসেবে গণ্য করে চালু করতেই হবে। দেখা গেছে যে, পল্লীর ৮০ ভাগ বিদ্যালয়ই ২/১ জন শিক্ষক দ্বারা চলছে। অথচ ওগুলোতে ৫ম শ্রেণী পর্যন্ত রয়েছে। তাহলে বলুন, ২ জন শিক্ষক দিয়ে ৫টি শ্রেণী কিভাবে চলে? অথচ ২ শ্রেণী বিশিষ্ট বিদ্যালয় ২ জন শিক্ষকদিয়ে চালু করলে ৮০ ভাগ ছাত্র-ছাত্রী লেখা-পড়া শিখতে পারতো। এ অবস্থায় বাধ্যতামূলক শিক্ষা ব্যবস্থার প্রবর্তন অবাস্তব ও অযৌক্তিক। বিদ্যালয়গুলোতে প্রয়োজনীয় সংখ্যক শিক্ষক ও ছাত্র না থাকায় দেশ নিরক্ষর লোকে ভরে যাচ্ছে। অথচ শিক্ষার নামে কোটি কোটি টাকা ব্যয় করা হচ্ছে। আমাদের মতে, পল্লী এলাকায় শিক্ষিত লোকজনকে নিরক্ষরতা দূরীকরণের কাজে উদ্বুদ্ধ করে তাদেরকে কাজে লাগাতে হবে। প্রত্যেক পল্লীতে নৈশ বিদ্যালয় চালু করে প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষকগণকে উক্ত কাজে অংশগ্রহণ বাধ্যতামূলক করতে হবে। প্রত্যেক মসজিদের ইমাম ও মক্তবের শিক্ষকগণকে নিরক্ষরতা দূরীকরণের কাজে অংশগ্রহণের ব্যবস্থা করলে তারা রাতের বেলায় নিরক্ষর মুসল্লীদেরকে ১২/৪ ঘন্টা পড়াতে পারবে।

মোটকথা, পল্লীর শিক্ষিতসমাজ ও প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষকগণ উক্ত কাজে অংশগ্রহণ করলেই পল্লী এলাকার ৮০ ভাগ লোকের নিরক্ষরতা দূরীকরণ স্বল্পকালের মধ্যে সম্ভব হবে বলে আমরা মনে করি।

—আবু মোহাম্মদ আদীল